সম্বিৎ চক্রবর্তী

ঘর

আজ সকালে ঘুম ভেঙে উঠে খুব ভালো লেগেছিল, ছোট্ট একটা পালক পড়ে আছে। বালিশের একদম কাছে। শালিখের পালক, বাচ্চার হাতের ছোঁয়ার মতো নরম। তার মানে ওরা আছে। শালিখ বর-বউ।

এ-জানালাটা ভারি সুবিধের। ঠিকঠাক মাপে মাপে আলো এনে দেয়। আলো, কিন্তু রোদ নয়। ভালো করে দেখা যায় অথচ চোখে লাগে না।

পালকটা পড়ে আছে আলগোছে। বালিশের পাশে। নড়াতে ইচ্ছে করছে না ওকে। থাকে থাকুক, আমার বিছানার ছোট্ট একটু ভাগ নিয়ে।

অনেকদিন পরে শালিখেরা একটা পালক ফেলল এদিকে, যেন দয়া করল ব্যাটারা। পালক খসাবি তো এদিকে খসা! বাড়ির বাইরের দিকে কেন? গত কয়েকদিন তো ঠিকমতো দেখাই যায় নি ওদের। মনে হয়েছিল বাসা ছেড়ে অন্য কোথাও সটকে পড়ার তাল করছে। তার আগের দিন কয়েকে সাড়া দেওয়া বলতে একটা খড়ের টুকরো। খড়ের টুকরাটাকে ফেলেছিল ঠিক বালিশের পাশে। তোদের অত গুমর কিসের রে? এতদিনে নিশ্চয়ই বুঝে গেছিস আমি ছাড়া থাকেও না কেউ এ-বাড়িতে। মাঝে-মধ্যে তো সাড়াশব্দ দিতে পারিস একটু-আধটু।

গত রাতে শোওয়ার সময় আলমারিটা খুলেছিলাম। পুতুলটা বার করব বলে। মেয়ে পুতুল। আদর করতে কেন জানি লজ্জা করে, জানালা বন্ধ করে দিতে হয়। যদিও দেখার কেউ নেই। লজ্জা লজ্জা করে বলে পুতুলটাকে বেশি-একটা আদর করা আর হয়ে ওঠে না। মাঝে মাঝে আবার ভুলেও যাই। ওই পুতুলের জায়গায় জুটেছে শালিখ দুটো। পুতুলের চেয়ে শালিখ ভালো। জ্যান্ত, সাড়াশব্দ দেয়। ঘরকন্না করে ওদের মতো। রোজই কথাবার্তাও চালায় ওরা কিচির-মিচির করে।

মাঝে-মাঝে রাগ হয়, ব্যাটারা যেন বড্ড বেশি সংসারী আর হিসেবি। কেবল কাজ, ঘর গুছোনো, খাওয়া-দাওয়া, যন্ত্রের মতো হতভাগারা। বাচ্চাগুলোকে কী জন্মের ট্রেনিংই-না দেয় ওড়ার জন্য। কঠোর শিক্ষক ওরা তখন, খানিকটা উড়ে যায় ধাড়িটা। পাশের বাড়ির কেবল্-এর তারে। বসে পড়ে। কিচির-মিচির ডাকতে ডাকতে বাচ্চাটার প্রাণ ওষ্ঠাগত করে। সে-ও যেন ভয়ে ভয়ে সময় নিয়ে নিয়ে খুট করে একটু ওড়ে। গিয়ে বসে ওই তারে। আবার ধাড়ি ফেরে; বাচ্চাও। নিস্তার নেই। টানা দুটি ঘণ্টা। কখনো বাবা কখনো মা। মজাও লাগে। কী নিষ্ঠা! চিন্তা-ভাবনা নেই শুধু ইন্‌স্টিংকট-ই। করতেই হবে, তাই করা। পূর্বনির্ধারিত।

শালিখের বাচ্চাগুলো চলেই যায়। এবারও গেল কিছুদিন আগে। শালিখ বর-বউ রয়ে গেছে; থাকিস, থাক। নিজেদের কাজও নিশ্চয়ই করবি। তাই বলে এদিকে একটু নজর দিবি না? বুড়ো মানুষটা সারাদিন ধরে একা-একা থাকে। আমার ঘরের ঘুলঘুলিতেই তো থাকিস। যখন আনন্দ হয়, কিচির-মিচিরের ঠেলায় ঘুমোয় কার সাধ্যি। সকালবেলায় মুড়ি বলো মুড়ি, বিস্কুট বলো বিস্কুট— খাস তো আমারই থেকে। সেই আমাকেই কি-না মাঝে-মাঝে চেনেই-না ব্যাটারা! কখনো কখনো টানা দিন-দশেক কোনো সাড়াশব্দ নেই। জানালায় বসা তো দূর অস্ত। দু-একদিন বোধহয় ঘুলঘুলিতে থাকেই না।

অকৃতজ্ঞ আর কাকে বলে। ওদিকে আবার হিংসে আছে ষোলো আনা। ওই তো গত পরশুর কথা, জানালা দিয়ে ঢুকেই এসেছিল ঘরে। আয়নায় চোখ পড়াতে সে কী পরিত্রাহী রাগী চিৎকার রে বাবা! আর, থেকে থেকে তেড়ে যাওয়া, অন্য কোনো শালিখ এসেছে মনে করে। এ কি আর যেমন তেমন হিংসে?

বেশ বোঝা যাচ্ছে ওরা ওদের ইচ্ছেমতো হিংসে করবে, আবার একইসঙ্গে অবহেলাও করবে আমাকে।

বেশি মায়া বাড়িয়ে লাভ নেই। তার চেয়ে পুতুলটাকেই নিতে হবে মাঝে মাঝে বিছানায়।

সোনু খুব ভালবাসত পুতুলটাকে। বেশ মনে পড়ে। যেন এই তো ক'দিন আগের কথা। যখন কোনো টীকা নিয়ে আসত সোনু ডাক্তারখানা থেকে, কী কান্না কী কান্না। ছোট্ট শরীরে ছুঁচের ফোঁড়। জ্বর চলে আসত। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমের মধ্যে ডুবে যেতে থাকত সোনু। আর নিস্তেজভাবে বলে যেত, "গৌ গৌ দাও, গৌ গৌ দাও"; পুতুলটাকে বলত, 'গৌ গৌ'। তো সে-পুতুলটাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাত ব্যথায় ক্লান্ত মেয়েটা। বেশি বের করতে তো সেইজন্যেই ইচ্ছে করে না পুতুলটাকে। ওতে সোনুর হাতের ছোঁয়া, চোখের জল লেগে আছে। এখন বছরে একবার বাড়িতে এলে 'গৌ গৌ'-এর কথা আর মনেই পড়ে না মেয়েটার।

আজ তিনদিন ধরে ব্যাপারটা ঘটছে। প্রথম দু'দিন তেমন কিছু মনে হয় নি। শুধু একটু আলগা ভালো-লাগা। তৃতীয় দিনেও একই ঘটনা ঘটায় টনক নড়ল। কার্যকারণ সম্পর্ক কী জানি না। সোনুর পুতুলটাকে বালিশের পাশে নিয়ে শুচ্ছি— আজ তিনদিন হলো। এই তিনদিনই ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে দেখি শালিখের নরম পালক পুতুলের গায়ে। যেন গলা জড়িয়ে আছে। শীতের প্রথম আলোয় নরম একফোঁটা মায়া যেন। পালকটা সোনুর পুতুলের মুখের হাসি হয়ে ফুটেছে। ঘটনাটা ঠিক। ব্যাখ্যাটা ঠিক কি-না জানি না। একা-একা থাকলে কত কিছুই-যে মনে হয়!

পরের দিন পালক ফেলে নি ওরা। কিন্তু একটা খড়ের টুকরো ফেলেছিল পুতুলের গায়ে। জানালায় এসে বসলেই পুতুলটাকে সরাসরি দেখতে পায়।

রোজ হয়তো পালক দেওয়া সম্ভব নয়। তাই পরে কয়েকদিন খড়ের টুকরো, ঝাঁটার শলা, এছাড়াও কিরকম দেখতে একটা শুকনো পাতাও ফেলল শালিখগুলো। তারপর আবার

পালক উপহার। পরপর দু'দিন। পুতুলের জন্য প্রায়-প্রায়ই কোনো-না-কোনো উপহার জুটে যায়। এমনকি, জানালায় আজকাল প্রায় রোজই শালিখ দুটোকে অনেকবার বসতে দেখা যায়। যার ঠিক নীচে বিছানায় পুতুল শুয়ে থাকে, গোটা জানালাটাই খোলা। এরপরে স্রেফ পরীক্ষা-নিরীক্ষার লোভে সোনুর পুতুলটাকে রাখলাম আলমারিতে তুলে। ও মা! শালিখের কাণ্ড দেখে আমি তো অবাক! পালক ফেলা দূরে থাকুক, এ-মুখোই হলো না কয়েকদিন। সত্যিই কি ওরা এতটা বোঝে!

এই শালিখ দুটোর কথা সোনুকে লিখেছিলাম। লেখা বলতে ই-মেল। সোনু অত্যন্ত দায়সাড়াভাবে দু-একটা বাক্যে জবাব দিয়েছে। এই পাখপাখালি, পুতুল ও আরো ছোটোখাটো নানা ধরনের অনুষঙ্গে আগ্রহ রাখতে রাখতে বড়ো হয়েছে সোনু। ওর নিজের মতো একটা খেলার জগৎ, একটা সংসারই ছিল এ-বাড়িতে, খাটের তলায়, কিন্তু আজকাল ওর কথাবার্তা শুনে মনে হয় কোনোদিন যেন শৈশবই ছিল না মেয়েটার। আমেরিকা ওকে এতটা পালটে দিল কি-না বলতে পারব না। আবার ভিতরে ভিতরে হয়তো দুঃখ আছে। ডিভোর্সটা আটকানো গেল না। আমি খানিকটা চেষ্টা করেছিলাম। যদিও তা ই-মেল আর মোবাইলে। ওরা ঠিক করেই নিয়েছিল। বরং আমি যাতে দুঃখ না পাই, সেজন্যে কী চেষ্টা দু'জনের। ডিভোর্সের পরেও জামাই কার্ড পাঠিয়েছে আমার জন্মদিনে। আমার ঘরে চোখের সামনে দু'জনের ছবি রয়ে গেছে এখনও।

সোনু একবার এসেছিল ডিভোর্সের পরে। এত কাজ আর এত অ্যাপয়েন্টমেন্ট যে এ-সব নিয়ে ভালো করে আলোচনার সুযোগই হলো না।

ডিভোর্সের পরও জামাইয়ের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগটা রয়ে গেছে সোনুর। তবে ও নিজে অন্য কোম্পানিতে জয়েন করেছে, ও-দেশে সাত-আট বছর, দশ বছর একটা বিয়ে টিকে থাকা খুবই আশ্চর্যের বিষয় আজকাল।

কলেজ লাইফ থেকেই সুকণ্ঠ আসত এ-বাড়িতে। এত ভালো লাগত আমাদের। ওদেরও যে বিচ্ছেদ হতে পারে এবং তারপরেও ওরা এত স্বাভাবিক এবং হাসিখুশি থাকতে পারে— আমি তো না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না। এখনকার অবস্থা দেখে এটাই ধারণা হয়, সেরকম বড়ো কোনো তিক্ততা ছাড়াই ওদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। অন্য দেশ, অন্য সমাজ এবং অন্য সময়— বেশি বুঝে কাজ নেই।

সোনু ভালো থাকলেই হলো। কিন্তু বাচ্চা মেয়েটাকে, আমার সাত বছরের নাতনিটাকে কেন বোর্ডিং-এ রাখল সোনু?

অনেকবার আমি জিজ্ঞেস করেছি আর, সোনু হোস্টেলের ওয়েবসাইট-টা বলে দিয়েছে। ব্যাখ্যায় না গিয়ে। মেয়েটা নাকি এমন হয়েছে— হোস্টেল ছেড়ে থাকতেও চায় না। বরং বাড়িতে থাকলেই চাকুরিরতা মা সময় দিতে পারবে না ওর জন্য। হোস্টেলে থাকলে বাবা-মা দু'জনেই দেখতে যেতে পারবে। সবাই দিব্বি বেঁচে আছে একা-একা, লেশমাত্র অসুবিধার অভিযোগ নেই। মাঝখান থেকে আমাকে দিনরাত হতভাগা শালিখগুলোর ডানা

ঝাপটানি আর কিচির-মিচিরের অপেক্ষায় প্রহর গুনতে হয়।

দুই

কয়েকদিন হলো সোনু এসেছে। মেয়েটাকে আনল না। স্কুলের পরীক্ষার জন্য। দেখলাম এবার তো এসেছে বেশ আটঘাট বেঁধেই। অনেক পরিকল্পনা নিয়ে। ঘর-দোরের সাজসজ্জা, খোল-নলচে বদলে দেবে একেবারে, সবকিছুকেই দেখি ও একটা প্রজেক্ট হিসেবে নেয় আজকাল, আর সেই অনুযায়ী উঠে পড়ে লাগে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে শেষ করবে বলে। এবারও সেইমতো লেগে গেল কাজে। ওর অনলস কর্মব্যস্ততা, দক্ষতা দেখে যাই আর, মুগ্ধ হই। তবু ছোটোবেলায় পড়তে বসে হঠাৎ ওর আনমনা হয়ে-যাওয়া মুখ আমাকে যেন বেশি টানে। জানালার বাইরে তাকিয়ে মাঠ-ঘাট গাছপালা অথবা আরো দূরে কোনো অনির্দেশ্য দিগন্তরেখা অবাক চোখে দেখে যেত সোনু— এমনকি যখন বেশ বড় ও, মাধ্যমিক দিয়েছে। ও-সব মনে পড়লেই যেন বেশি ভালো লাগে। ওই বেহিসেবি উদাসীনতা সোনু কি আর এ-জীবনে পাবে!

একটা লোক লাগিয়ে ঘর-দোর সব সাফ করে ফেলল ও। আমার একটু অস্বস্তি হলো। এ-বয়সে সেট ব্যবস্থা ছেড়ে নড়াচড়া করা বড়ো কষ্টের— দু-একদিনের জন্য হলেও।

কিন্তু সত্যি বলতে কী ও যে-ব্যস্ততায় কাজ করতে লাগল, ঘর রং-টং করা থেকে শুরু করে বাগান-সংস্কার— আমি ঠিক মানিয়ে নিতে পারছিলাম না। যা করেছে ভালোর জন্যই করেছে, করেছে আমার জন্যই। কিন্তু অসুবিধা হচ্ছিল, হচ্ছিল অস্বস্তি। ওই গতি যেন সহ্য করা যাচ্ছিল না। ওর কম বয়সের গতির সাথে যোগ হয়েছিল ও-দেশের বেঁচে-থাকার গতি।

এক-একটা সংস্কার হচ্ছে আর আমার মনে হচ্ছে যেন একটা একটা একটা টুকরো খসে পড়ছে আমার জীবন থেকে, এ আমি কী করে বোঝাই সোনুকে। ফলে গোল বাঁধল। আমার বসার ঘরের একটা দরজা বন্ধ করে ও অন্য দিক দিয়ে দরজা বের করতে চাইল। স্থাপত্যের যুক্তিতে পুরোপুরি ঠিক। এতে সুবিধা হওয়ারই কথা। কিন্তু আমার ভালো লাগল না! কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলাম না, আর যা মনে পড়ে যাচ্ছিল বলে এটা মেনে নিতে চাইছিলাম না তা সোনুকে বলতেও পারলাম না।

আমি আর সে যখন গল্প করতাম ছুটির সন্ধ্যাগুলোতে! 'সে' বলতে সোনুর মা।

'তুই আর কী-ই বা মনে রেখেছিস সোনু। ওই দরজা দিয়ে তুই— সেই ছোট্ট সোনু আমার এই একটু, ঠিক এক চিলতে উঁকি মারতিস এ-ঘরে। নিজেকে না-ধরা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে গিয়ে তোর সে কী সতর্কতা রে সোনু! আর, এত বোকা ছিলিস, বুঝতিসই-না চোখের আগে আগে তোর মাথাটাই আমরা দেখে ফেলতাম। কখনো তোকে জিজ্ঞেস করা হয় নি তুই কী দেখতে চাইতিস। কেন উঁকি মারতিস। আমাদের দিকে!'

সেই ছবি এই দরজায় এখনও সেঁটে আছে। ও দরজা তো আমি ভাঙতে দেবই না তোকে। আর বলবও না কেন দেব না। এ আমার নিজের আনন্দ, নিজের স্বাদ। ভাগ করতে গেলেই আরামটুকু যাবে।

তিন

সোনু একটু বিরক্ত হয়ে শেষপর্যন্ত প্রস্তাবটা ফিরিয়ে নিল।

উত্তরের ঘরটা নিয়ে পড়ল এবার ও। মেঝেতে মার্বেল বসিয়ে যাবেই যাবে। পরের বার ফিরে এসে ও-ঘরটা। কিন্তু এত কি হতে দিতে ইচ্ছে করে? ওই ঘরের ফটো-মেঝেতে তো তুই-ই আছিস। সে আর বুঝবি কেমন করে? বাঁদিকে দেওয়াল ঘেঁষে ঘরের পশ্চিম-মুখে যেখানে কোনো জিনিস রাখতে দেই না আমি, সেখানেও তুই-ই রয়ে গেছিস। সিমেন্ট-ফাটা অংশটুকু লক্ষ করেছিস বোকা মেয়ে! ঠিক তোর ছোটোবেলার মুখের আদল ফুটেছে! এ শুধু বাপ-মা-ই বোঝে। বলতেও পারি না। আবার জিনিসটা নষ্ট করতে দিতেও পারি না। সোনুর সঙ্গে তর্কাতর্কিই হয়ে গেল একচোট। শেষপর্যন্ত এবারও আমারই জিত হতো যদি-না ও হঠাৎ ছোটোবেলার কোনো মুহূর্তের মতো আনমনা করুণ চোখে না তাকিয়ে ফেলত। তাই ভাবলাম, থাক, মেঝের ফাটাটা তো সোনু নয়, ওর ছবি বড়ো জোর, ছবিটার জন্য আসল মেয়েটাকে কষ্ট দেব! মেনে নিলাম ওর মার্বেল-সজ্জা।

কয়েকদিন বাড়ি-ঘর-দোরে হইচই, প্রচণ্ড ব্যস্ততা, শব্দের মাঝে সোনু আমাকে ডাক্তার এনে দেখিয়ে, ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা রেখে, কম্পিউটারের তথ্য-টথ্য ঠিকঠাক করে দিয়ে—এক কথায় বলা যেতে পারে, 'আমি' নামক ফাইলটাকে আপ-টু-ডেট করে দিয়ে যখন চলে গেল, হঠাৎ টের পেলাম শালিখ দুটোও সরে পড়েছে। এত হইচই, ওলট-পালট, নতুন রং করা, এ-সমস্ত বোধহয় ওদের শান্তি বিঘ্নিত করেছে। কিংবা সোনু বা ওর মিস্ত্রীরাই হয়তো লাঠি বা শলা দিয়ে খুঁচিয়ে তাড়িয়েছে বেচারাদের। ওদের কথা সোনুকে বলাই হয় নি এবার। বলবই-বা কী করে? এমনিতে ওর আমেরিকান ব্যস্ততা; আর এ-ক'দিন বাড়িতে লোকজন, বন্ধু-বান্ধব লেগেই ছিল। বেচারা শালিখদের দোষ দিয়ে লাভ নেই।

তবে এ-কথা খুবই সত্যি যে সোনুর জন্য দুঃখও হচ্ছিল। ও তো ওর নিজস্ব মতে আমার ভালো করার চেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছিল। প্রতিটি কাজই এক হিসেবে পরিকল্পিত, যুক্তিসংগত। তর্কাতর্কি হয়ে গেল বলে মেয়েটার জন্য এখন কষ্ট লাগছে।

ভাবতে ভাবতেই মনে পড়ল ঝাড়-পোঁছ আর রং করার সময় সোনুদের ছবিটা আলমারিতে ঢুকিয়ে রেখেছিলাম। যেজন্যে দেয়ালটা ফাঁকা আর গম্ভীর লাগছিল, রাত্রে শোয়ার সময় আলমারি খুলতে হলো। খুলে যা দেখতে হলো তা আমাকে সত্যিই হারিয়ে দিল। সোনু, তুই তাহলে ছোটোবেলাটা এখনও...?

পুতুলটাকে গাঢ় লাল চেলিতে বউ সাজিয়ে আলমারিতে গুছিয়ে রেখেছে মেয়েটা। তুই

তাহলে... ? কী বলব। খুব কাঁদলাম। কেঁদে বড়ো আরাম হলো। কী যেন একটা বিশ্বাস ফিরে আসার আরাম। ছোট্ট পুতুল সোনা! তোমাকে কি আমি এই আলমারিতে আর বন্ধ করে রেখে দিতে পারি মা?

আবার সে চলে এল আমার খাটে, প্রায় লাফাতে লাফাতে। বালিশের একটা কোণ দখলও করে ফেলল ওর ছোট্ট নরম মাথার জন্য।

দিন কেটে গেল কয়েকটা। খাটের পাশের জানালা হাট করে খোলা থাকে দু'বেলা। পুতুলের মুখে এসে পড়ে নরম আলো। মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে যায় দরদি বাতাস। ইচ্ছে করে, উঠে বাইরে গিয়ে বাগানে বসি। সোনুর বাগানে। পাখপাখালির দেখা পেতে পারি, নিদেনপক্ষে পিঁপড়ে, মৌমাছির। এ-সব ভাবতে ভাবতে দিন দুয়েক যেতেই আর-একবার কাঁদতে হলো আমাকে এক ঝলমলে সকালে, শেষ বয়সে। পুতুলের মাথায় ছোট্ট পালক। ওরা এসে গেছে। ওরা এসে গেছে।